হাজতে বর্ষা

হাসান শাওন

হাজতে বর্ষা

হাসান শাওন

প্রসিদ্ধ

লেখা স্পষ্ট– শাপনুর তোর বিচার হবে। কে শাপনুর? নায়িকা শাবনূর? নয়ন হাই তোলে। রাত তখন সাড়ে ৯টা।

একটু পর একজন এলো। ওদের ড্রেস পরণে।

- মশা বেশি? কয়েল লাগবে আপনার?

প্রচুর মশা। কিন্তু নয়ন ডানবামে মাথা নাড়ায়। বাসায় তার ৩ বছরের মেয়ে আইশা মশা মারে না। বলে,

- বাবা, হাতে ফুঁ দাও। মতা।

নয়ন আইশার মতো ফুঁ দিচ্ছে আর হাত, পা নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে। প্রচুর মশা। আবার পেল গান্ধি পোকার গন্ধ। ছোটবেলায় ওরা বলত 'পাদের গন্ধ'।

একটু পর হাজতে তালা খোলার শব্দ। এক চুল ছাঁটা দীর্ঘদেহী মাসলধারী এগিয়ে আসেন। পরনে টি-শার্ট, জিন্স। তার হাতে দুটি ফোন। একটি ফ্ল্যাশসহ নয়নের দিকে তাক করা। সরাসরি প্রশ্ন তার।

- এই ফোন আপনার?

- জ্বি।

- আপনি লিখেছেন এই লেখা?

- জ্বি।

আগত এবার দুটি ফোনই পকেটে রাখে। সিগারেট বের করে ধরিয়ে বলে,

- বেনসন লাইট খান? কেন লেখেন এইসব? রাজা হতে চান?

নয়ন চুপ। মাসলধারী বলে যায়।

- এটা তো আপনার দ্বিতীয় অ্যাকাউন্ট। কেন বারবার একই কাজ করেন? আমাদের প্রেসারে রাখেন। . . .

নয়ন মাসলধারীর দিকে মনোযোগ দেয়। তার কালো নাইকির টি-শার্ট রঙ জ্বলা। বুকে সাদা টিক চিহ্নের নিচে লেখা 'জাস্ট ইট'। মাঝের 'ড়ু' মুছে গেছে। পড়া যায় না। নয়ন জানতে বলল,

- আপনি কে? ভিডিও করলেন কি কিছু?

নাইকিওয়ালা রেগে যায়।

- চুপ থাকেন। এটা হাজত। আপনি আসামি। আমি আইনের লোক।

আইনের লোক তাড়াতাড়ি চলে যায়। বের হওয়ার সময় ওদের একজন তাকে স্যালুট দেয়।

নয়ন আবার বসে যায়। ঝিমায়। ক্ষুধা পায়। বউয়ের পাটশাক তো কেনাই হলো না।

কিছুক্ষণ পর আরেকজন হাজতে। সে পুরাই হুজুর। মুখে দাড়ি। মাথায় টুপি। গায়ে পাঞ্জাবি। লোকটা ঘামছে। ক্লান্ত। এসেই কম্বলে শুয়ে পড়ে টুপি খুলে। একটু পর উঠে বসে। ছারপোকার কামড়ে? কে জানে?

নয়ন তার সাথে কথা শুরু করে।

- ভাই, আপনাকে কেন এনেছে?

নবাগত দাড়ি খিলাল করে। বলে,

- ভাই, আমরার হুটেল। ভাতের হুটেল।

নয়ন চুপ থাকে। হুটেলের ভাই বলে যান।

- মোবাইল কোটে বইছে। লকডাউনে খুলছিলাম তো . . .

নয়ন জিজ্ঞেস করে।

- আপনার পাঞ্জাবি ভেজা কেন? মেরেছে ওরা?

লোকটি হেসে ফেলে। খুব সরল তার হাসি।

- না বাই। শুধু হাতে লক দিছিলো। গাড়ি ছিলুইন্না। রিশকায় লকআপ দিয়া আনছু। বাইরায় তো খুব বিষ্টি।

নয়নের চোখ জ্বলে ওঠে। ও আবার জিজ্ঞেস করে।

- ভাই, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে?

লোকটি মাথা উপর নিচ করে। টুপি ঠিক করে আবার মাথায় বসায়। দেয়ালে হেলান দেয়।

নয়নের সিগারেটের তেষ্টা পায় খুব। ও উঠে দাঁড়ায়। ওরা মাঝে বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা খেলে বাসায়। সহজ খেলা। ইউটিউবে 'রেইন সাউন্ড' লিখে সার্চ দেয়। আর ভলিয়ুম বাড়িয়ে দেয়। আর সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয় ঘরের। আইশা তখন হাসে আর বলে,

- বাবা, বিস্তি। থাতা দাও।

নয়ন কিছু সময়ের জন্য হাজতের গন্ধ ভুলে যায়। ওর পাটশাকের ডাল দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করে। আইশাকে চুমু খেতে ইচ্ছা করে। ওর বৃষ্টি বৃষ্টি খেলতে ইচ্ছা করে।

ডানা ভাঙা ফড়িংয়ের গল্প

- এই যে শুনুন। শুনুন। জ্বি। আপনি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনি। হ্যাঁ। আপনিই। এদিকে আসুন। এই যে এই দিকে। এই দিকে। এই দিকে। হ্যাঁ। কাছে আসুন। আরও আরও। হ্যাঁ। নিচে নিচে। এবার নিচে তাকান। আরেকটু। হুম। দেখতে পাচ্ছেন আমাকে?

আমি নিচে তাকাই। রাস্তার ম্যানহোল থেকে কে ডাকছে? আটকে পড়া কেউ? এগিয়ে যাই। কিন্তু আমার তো অফিস টাইম। দ্রুত চেকইন করতে হবে। নইলে বেতন কাটা। আর এসব তো ফায়ার সার্ভিস, থানা পুলিশের কাজ। আবার হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয় কি-না? তবু এড়িয়ে কীভাবে যাই? এবার ভালো মতো দেখি।

ম্যানহোলের ঢাকনা ঠিক আছে। কোনো ফাঁক নেই। কোনো মানুষও দেখিনা। একটা ছোট্ট ফড়িং পড়ে আছে। তাহলে কথা বলছে কে? এত মানুষ হাঁটছে তাদের নয়। আমাকেই কেন বলা? আর ফড়িং কেন মানুষের মতো কথা বলবে? হ্যালুসিনেশন হচ্ছে কি আমার? গত রাতে অবশ্য ঘুম হয়নি ঠিকঠাক। সারারাত লোডশেডিং ছিল মহল্লায়। গরমে ঘুম হয়নি। সকালে উঠতে হয়েছে বেশ ভোরে। এখনও ফড়িংয়ের কথা বলা শুনতে পাচ্ছি।

- আপনি তো দেখলেন আমাকে। এরপরও এত কী ভাবছেন?

আমার কি ফড়িংয়ের কথার উত্তর দেয়া ঠিক হবে? ভাবলাম চুপ থাকি। কিন্তু ফড়িং কথা বলেই যাচ্ছে।

- আমরা কয়েকজন উড়ছিলাম। মা ছিলেন সাথে। হঠাৎ আমি দলছুট হয়ে যাই। এই সামনের একটা পিলারে ধাক্কা খাই। এরপর জ্ঞান হারাই। গড়াতে গড়াতে মনে হয় এখানে এসেছি। এর মধ্যে আপনাদের একজন পিষে মাড়িয়ে গেলেন। সারা গায়ে ব্যথা। ডানা বোধ হয় ভেঙেছে। প্লিজ একটু হেল্প করুন আমাকে। শুনছেন?

আমি ফোনে ঘড়ি দেখি। এখান থেকে অফিস ১৫ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব।

আমাকে প্রতিমাসে মেস ভাড়া দিতে হয়। বাকি টাকা গ্রামে থাকা মায়ের জন্য। তার কিডনিতে জটিল অসুখ। ওষুধই লাগে মাসে ৬ হাজার টাকার।

এসব যখন ভাবছি, ডানা ভাঙা পিচ্চি ফড়িংয়ের কথা বলা তখনও থেমে নেই।

- অনেককে ডেকেছি। কেউ শুনতে পাননি। আপনি শুনেছেন। আপনি দাঁড়িয়েছেন। আর একটু কি কষ্ট করবেন আমার জন্য? একটু ধরে আমাকে যেকোনো গাছের একটা ডালে রাখবেন। একটা গাছ পেলেই আমি বাঁচব। আমার মা আমাকে খুঁজে নিতে পারবেন। প্লিজ, একটু দয়া করুন। আমাকে বাঁচতে দিন। মায়ের কাছে ফেরত দিন।

বুঝতে পারি আজ বেতন কাটা যাবেই। তবু নিচু হয়ে ফড়িংটাকে আঙুলে বসাই। কিন্তু প্রথমবারের মতো খেয়াল করি আশেপাশে কোনো গাছ নেই। একটাও নেই। শপিংমল আছে। ব্যাংক আছে। কাস্টমার কেয়ার আছে। বিলবোর্ড আছে অনেকগুলো। পুলিশ চেকবক্স আছে। কিন্তু একটা গাছ নেই। এ কী দশা?

ফুঁ দিয়ে ফড়িংটাকে উড়িয়ে দেই বাতাসে। অফিসের দিকে হাঁটি। যা ঘটল তা তো কাউকে বলা যাবে না। উল্টো মানুষ পাগল ভাববে। এখন অফিসের স্যারকে বলে 'লেট'টা কাটানো যায় কি-না দেখি। দ্রুত হাঁটি বাকি পথ।

মুদ্রা

আমি গুলশান চিনি না ঠিকমতো। এক নম্বর, দুই নম্বরে তালগোল পাকাই। কাগজে ঠিকানা লিখে দিলে আসতে পারি। ফেরার সময় ভেজাল লাগে।

৬ নম্বর বাসে আসি। কাওরানবাজার থেকে ২৫ টাকা ভাড়া।

কাওরানবাজার আমার অফিস। পত্রিকা অফিস। মহল্লার অনেকে আমাকে ভাবে সাংবাদিক। বউকে সত্য বলেছি শুধু। আসলে আমি পত্রিকা অফিসের পিয়ন। বেতন ৬ হাজার ৭০০ টাকা। অনেক ডিউটি আমার। স্যারদের রুম পরিষ্কার করি। পানি বোতলে ভরে দেই। পত্রিকার ফাইল বানাই। চা নিয়ে যাই রুমে রুমে। অফিসের বাইরেও ডিউটি থাকে। ঐ যে গুলশান। ঐ এলাকায়

আমাদের বাসা তেজকুনীপাড়া। অফিস যাই রিকশায়। কখনও হেঁটে। কাওরানবাজারের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটায় আমার অফিস। লিফটের ১৭। এ বিল্ডিংয়ের ছাদে নামাজের ব্যবস্থা আছে। ছাদ থেকে রায়েরবাজারের দিকের তুরাগ নদী দেখা যায়। নিচের রাস্তায় গোলমাল বা এক্সিডেন্ট হলে অফিসের ক্যামেরাম্যানরা ছাদে ওঠে। ছাদ থেকে নিচের ছবি তোলে।

ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে আমাকে বেশি পছন্দ করে সুভাষদা। পাগল পাগল ভাবের একটা মানুষ। আমাকে দেখলেই শুধু বলেন, "শহীদ, কেমন কাটছে ঈদ?" আমি হাসি। অফিসে আমাকে একমাত্র তুই ডাকেন সুভাষদাই।

একবার নূরী শরীফকে নিয়ে অফিসে এসেছিল। সুভাষদা তখন আমাদের ছবি তুলে দেন। আমি ৮০০ টাকা দিয়ে সে ছবি বাঁধিয়েছি। আমাদের ঘরে এখন সে ছবি। নূরী বলে, "ঘরে ছবি থাকলে ফেরেশতা আসে না। তুমি ছবি সরাও।" আমি রাজি হই না। শরীফ যখন ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার বাবা..." তখন খুব ভালো লাগে।

পত্রিকা অফিসের চাকরিতে ছুটি কম। মহররম, মে দিবস আর দুই ঈদে তিনদিন করে। ঈদের তিনদিন শ্বশুরবাড়িতে চলে যাই। আমার কোনো আত্মীয় ঢাকায় থাকে না। আমরা মুন্সীগঞ্জ যাই লঞ্চে। দোতলা লঞ্চ। সদরঘাট থেকে ছাড়ে। ১ ঘণ্টার পথ। নূরী চানাচুর খেতে পছন্দ করে লঞ্চের। অনেক ফেরিওয়ালা থাকে লঞ্চে। গতবার এক জাদুকরকেও পেয়েছিলাম। সে কাগজ কেটে জোড়া দেয়ার ম্যাজিক দেখায়। শরীফ খুব খুশি হয়েছিল দেখে। আমি জাদুকরকে ৫০ টাকা দেই। সে খুব খুশি হয়। জিজ্ঞেস করি, "নাম কী?" সে বলে, "ফরিদ, রাজবাড়ি, মাটিপাড়া।" এরপর হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলে, "পুরা অ্যাড্রেস দিয়া দিলাম। আইসেন।"

বললাম, "আচ্ছা আসব।"

কিন্তু আমার কি কখনও যাওয়া হবে মাটিপাড়া? এই লোক কি ঘরেও জাদু দেখায়? তার বাচ্চা আছে? কী মজা! এগুলো ভাবলাম। মুখে বললাম না কিছুই।

মুন্সীগঞ্জ আমার বউ, ছেলের খুব পছন্দ। শ্বশুরবাড়ি শহরের বাইরে। খুব নিরিবিলি জায়গা। গাছপালা অনেক। আমি না হয় সারাদিন অফিসে থাকি। নূরী তো সারাদিন তেজকুনীপাড়ার ঘরেই থাকে। এজন্যই ও বাপের বাড়ির জন্য তড়পায়। আমাকে ব্যবসা করতে বলে সেখানে। কিন্তু আমি পত্রিকা অফিসের চাকরি ছাড়তে রাজি না। সেদিন মহল্লার চায়ের দোকানের মেহেদী ডাক দিল, "সাংবাদিক সাব, চা খাইয়্যা যান।" কাছে গেলে জিজ্ঞেস করে, "ভাই, টেরাম্প হালা কি যুদ্ধ লাগাইয়াই দিব না-কি? কন আপনি তো ছাংবাদিক মানুষ।"

লেগুনা যাত্রীদের একজন পত্রিকা বের করেন। বিনোদন পাতায় বড় ছবিসহ নিউজ। "নতুনভাবে ফিরছেন সানি লিওন"। পুরুষ যাত্রীর অনেকের চোখ তখন সানি লিওনের ছবির দিকে।

পাইকপাড়ায় লেগুনার ছাদে থাপ্পড় রইছের। গাড়ি থামে। সানি লিওন থেকে হুশ ফেরে সবার।

- "ওস্তাদ, বাইমে চাপান। নামবো একজন।" লেগুনার পাদানিতে থাকা একজন নামেন।

বাঙলা কলেজের একটু আগে র‍্যাবের একটি গাড়ি তীব্র সাইরেন দিয়ে লেগুনাকে পাশ কাটায়। তখন মায়ের কোলে বসা 'সুপারম্যান' লেখা ব্যাগটি হাত থেকে পড়ে যায় শিশুর। তার মা ব্যাগটি ওঠিয়ে আবার শিশুর হাতে দেয়। কেউ কোনো কথা বলে না।

কলেজের সামনে আবার রইছের থাপ্পড়। গাড়ি থামে।

- "ওস্তাদ, ইসটুডেন নামবো।"

লেগুনার পাদানি থেকে আরও একজন নামেন।

বেশিরভাগ যাত্রী টেকনিক্যাল মোড়ে নামলেন। তাদের গন্তব্য গাবতলী। এরপর লেগুনায় যাত্রী তিনজন।

তিতিরের একহাতে মায়ের জন্য আনা ঘরে পড়ার শাড়ির ব্যাগ। অন্য হাতে টাকার পার্স।

এত প্যাসেঞ্জার নামায় আক্কাস আর রইছের উদ্বেগ। সামনের সিট থেকে আক্কাসের চিৎকার।

- "প্যাসেঞ্জার উডাস না ক্যা...?

উত্তর দেয় রইছ।

- "ওস্তাদ, এডি গাবতলী যাইবো। এই দিককার না।"

ড্রাইভার থামে না। বলে, 'তুই ডাক।'

শুরু হয় ছাদে থাপ্পড়। সঙ্গে ডাক, "ঐ মোহাম্মদপুর . .মোহাম্মদপুর. . ."

আক্কাস পেছনে থাকা রইছকে জোরে বলে,

- "আমিও বাড়ি যামু। রাইত দশটায় গাবতলী আমু। ৮ টা পর্যন্ত গাড়ি চালামু। ট্যাকাটুকো মহাজনরে দিমু। আল্লাহর নামে রওনা দিমু। গাড়ি পাই আর না পাই। তুই প্যাসেঞ্জার ওডা। আইজ টাইম নাই। কথা বুঝছোস . . .পোলা?"

এই জায়গাতেই তিতিরের ১০০ টাকার নোট নিয়ে ঝামেলা শুরু। মাত্রই ওস্তাদের ঝাড়ি খাওয়া হেলপার রইছ বলে, "এই ট্যাকা ক্যামনে চালামু। উডেন ক্যা এমুন নোট নিয়া।"

তিতিরের পার্সে আর কোনো টাকা নেই। ২০ টাকা ভাড়া দিয়ে তার কাছে থাকবে আর ৮০ টাকা। মায়ের ভাগ্য জেনে এরপর ফিরতে হবে তা দিয়েই। ওর তাড়া মায়ের কাছে যাওয়ার। তিতির বলে,

- "ভাই, আপনি পুরো ১০০ টাকাই রাখুন। ৮০ টাকা ফেরত দিতে হবে না।" রইছ তখনও ফুঁসছে।

- "আপনের টেপ মারা ট্যাকা রাইখ্যা কী করুম?"

লেগুনা চলতে থাকে। দারুস সালাম, কল্যাণপুর পাড় হয়। নোট নিয়ে ঝামেলা মেটেনি তখনও। কল্যাণপুরের একটু আগে বেশ কিছু যাত্রী মেলে। গাড়ি ভরে যায়। এখন লেগুনা শ্যামলীর কাছাকাছি। কিন্তু তিতিরের সাথে রইছের মীমাংসা হয়না।

লেগুনার সহযাত্রী রাজমিস্ত্রি বলেন,

- "একটু টেপে সমস্যা কী? ভাড়া রাখ।"

তিতির বলে,

- "ভাই, এটিএম থেকে তোলা টাকা। টেপ মারা আগে দেখিনি। আমার কী দোষ?"

এ পর্যন্ত ড্রাইভার আক্কাস এ নিয়ে কথা বলেনি। এবার সে বলে,

- "ঐ, আপা কই নামবো?

- "সামনেই। হল শ্যামলী।"

আক্কাস বলে,

- "ভাড়া লাগবো না। আপারে নামা।"

তিতির নামে। ড্রাইভিং সিটের সামনে গিয়ে আক্কাসের সামনে দাঁড়ায়। মুখের মাস্ক নামায়।

- "ভাই, আপনাকে আবার কীভাবে পাবো? ভাড়ার টাকা তো আমি দিতে চাই।"

আক্কাস উত্তর দেয়।

- "যাইবেন কই? হাসপাতাল? আপনের মা ভর্তি? করোনা? যান আপা। খালাম্মার লাইগ্যা দোয়া করি। হেরেও দোয়া করতে কইয়েন। আল্লাহ ভরসা।"

হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবে আহাদ। কী বিচিত্র মানুষের মন! ফরিদপুরের পথে ক্লান্ত মানুষেরও ফিলিস্তিন মনে পড়ে। হঠাৎ একটা বাস থামে। ঠাঁসা যাত্রী। পথের সব কিছুতেই ভিড় উপচে। বাইক, সাইকেলে তিনজন। ট্রাকের পাদানিতে লোক দাঁড়িয়ে। হ্যাচারির মাছের গাড়ির ছাদে মানুষ।

স্টপেজ ছাড়াই বাস থেকে নামলেন দুজন নারী। সেই সুযোগে আহাদের পায়ে হাঁটা থামল। ব্যাকুলভাবে সে বাসের হ্যান্ডেল ধরে। তার ঠাঁই হয়। হাতের ব্যাগে মা, বউ আর মেয়ের ঈদের কাপড়। কাঁধেরটায় নিজের কাপড়। আহাদ ভাবে, যতটুকু সম্ভব যাওয়া যাক বাসে। পরের পথ পরে দেখা যাবে।

আজ আবার এদিকে বৃষ্টি হয়েছে। পথ হাঁটা আহাদের পায়ে কাদা। বাসের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়ানোও যায় না। কাঁধে, হাতে ব্যাগ। ড্রাইভার আরও ট্রিপের আশায় চালাচ্ছিল দ্রুত। ভিড় বাসে কোনো মতে শরীরের একটা অংশ রাখার জায়গা হয় আহাদের।

একটা ছোট কালভার্ট অতিক্রমের সময় ঘটল ঘটনা। পথ পিচ্ছিল। ড্রাইভার ব্রেক কষে সামনে গাড়ি দেখে। আহাদের হাত দুই সেকেন্ডের জন্য ফস্কায়। হাতের ব্যাগটা নিচের জলাভূমিতে পড়ে যায়।

আহাদের মনে প্রথম ভাসে তার আইমার মুখ। ঈদের জামা, পাজামার সাথে গোলাপী ছোট্ট এক জোড়া জুতা কিনেছিল সে মেয়ের জন্য। তা পায়ে দিয়ে হাঁটলে 'পিচ' 'পিচ' শব্দ হয়।

আর একটু পর এক এক করে বাসের যাত্রীরা নেমে যান। এক পর্যায়ে আহাদ বাসে সিট পায়। ভাবে মা, বউ বাদ থাক। ঈদে মেয়েটার জন্য জামা, জুতার কী হবে? ঈদের দিন বাসার সবাই মিলে নতুন জামা পড়ে ছবি তোলার খুব ইচ্ছে ছিল তার। নিজের ওপর রাগ হয় তখন নিজেরই। এমন ঝুলে বাসে আসার কথা তো মাকে বলা যাবে না। না যাবে বউকে। সবাই তাকেই দোষ দেবে। তাই সে ঠিক করতে পারে না ঈদের সময় খালি হাতে শহর থেকে ঘরে ফেরার কোনো নির্দিষ্ট কারণ। এমন তো কোনোবার হয় না।

ফরিদপুরের আগেই বাস থামে। বাড়ির পথের একটা রিকশা পেয়ে যায় সে। ঈদের আগে খালি হাতে শহর পাড়ি দেয়া আহাদের নিজের ঘরের পথ এখন আর বেশি দূরে নয়। তবে তার কানে বেজে যাচ্ছে আইমার জুতার 'পিচ' 'পিচ' শব্দ। আর মনে ঘরের মানুষের প্রশ্ন, কী আনছো? - এর অজানা উত্তর।

তালা-চাবির গল্প

তালা-চাবি মিস্ত্রি আমি। মিরপুর ১ নম্বরের ফুটপাতে বসি। থাকি ৩ হাজার টাকা ভাড়ার পাইকপাড়ার টিনশেডে। বউ আছে। কন্যার বয়স ৩।

আমার ফোন নম্বর লেখা লিফলেট আছে অনেক জায়গায়। কল আসলে বাইরে গিয়েও কাজ করে আসি।

এই লিফলেটিং করে হয়েছে এক সমস্যা। নানা কিসিমের ফোন আসে। একজন সেদিন ফোন করে বলে, "ভাই, আমার দোকানের শাটারে সমস্যা। শ্যাওড়াপাড়ায় একটু আসতে পারবেন?" বিরক্ত লাগে। বলি, "ভাই, আমি শাটার মিস্ত্রি না। তালার কাম থাকলে কন।"

আবার সেদিন একজন ফোন করে বলল, "বাথরুমের কলের সমস্যা।" বলি, "ভাই, আমি পানির পাইপের কাজ জানি না।"

মানুষ এই ভুল কেন করে জানি না। ৮০০ টাকা খরচ করে ২ হাজার লিফলেট ছাপিয়েছি। সেখানে স্পষ্ট লেখা-

"তালা মিস্ত্রি

মোহাম্মদ সাদেক হোসেন।

ফোন - ০১০১০.....

নিচে লেখা, 'বাসায় গিয়ে তালা খোলা হয়।"

এরপরও মানুষ ভুল করে। মেজাজ কি শুধু শুধু খিঁচে?

সেদিন এক ফোন আসলো দুপুরে। একটা মেয়ের। খুব ব্যস্ত। পল্লবীর একটা ঠিকানা বলল। রওনা দিলাম। আবার মেয়েটার ফোন, "ভাই, একটু তাড়াতাড়ি আসেন।" সেখানে যাওয়া পর্যন্ত ৪ বার ফোন দিল মেয়েটা। একটু পর পর, "ভাই কত দূরে?" বিরক্ত লাগে। বলি, "আসতেছি আপা . . আসতেছি।" মনে মনে ভাবি, বাথরুমের লকই হবে। এখনের অ্যাপার্টমেন্টে বাথরুম লক হয় বেশি।

সেই বাড়িতে পৌঁছি। অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি। চারতলায় ফ্ল্যাট। মেয়ে সিঁড়িতে

দীন মোহাম্মদের কথা

দীন মোহাম্মদ আমাদের বন্ধু। হঠাৎ হঠাৎ তার সাথে দেখা হয়। ঝপঝপ করে অনেক কথা বলে একবারে। তারপর আবার উধাও।

সে কোথায়? বহুদিন দেখা নেই তার সাথে। শেষ কি শাহবাগ না মতিঝিলের শাপলা চত্বরে তাকে দেখি? মনে নেই।

অনেক গল্প করেছিল সেদিন। এ কথা, সে কথা। কোথায় যেন যাবে বলছিল। জায়গার নাম বোধহয় বিধানখালী। এ জায়গার বাস ছাড়ে কলেজগেট, আসাদগেটের মাঝখান থেকে। আরও দ্রুত ট্রেনে যেতে চাইলে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন হয়ে।

দীন মোহাম্মদ বলছিল, সে মাওয়া ও পদ্মার ওপার গোপালগঞ্জ পর্যন্ত লোক লাগিয়েছে। কিশোরগঞ্জের হাওরেও। মাছের ব্যবসা করবে। দোকানের নাম ঠিক করেছে 'মীন শপ'। বরফ ছাড়া তাজা মাছের দোকান। দিনেরটা দিনেই সেল। দোকানের পজেশন ভাড়া উঠে আসবে ২১ মাসে। ট্রান্সপোর্টেশন খরচও ফিক্সড। সব হিসাব করা আছে নাকি তার। কোথায় দোকান তা অবশ্য সে জানায় না। আমি বেশিরভাগ শুনি তার কথা। কিন্তু দীন মোহাম্মদ বলেই যায়। তার মতে, এটাই ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টির ডিজিটাল বিজনেস।

"বুঝলেন মাছ কাস্টমার খাবেই। লস নাই। সমস্যা হচ্ছে, আমি আবার এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। দোকানের কাউন্টারে বসার জন্য গদি পর্যন্ত কিনেছি এবার।"

এবার দীন মোহাম্মদ আরেক গল্পে গেল। গদি পাওয়ার বৃত্তান্ত। ঐ গদি কিনতেই তার বিধানখালী যাওয়া। বলেই যাচ্ছে সে।

"বিধানখালীতে ঐ দোকানের নাম বুঝলেন হাসু গদি স্টোর। বাবার দেয়া দোকান। এখন চালায় মেয়ে। এই শুধু গদির ব্যবসা করেই এখন ওরা বড়লোক। পুরো এলাকায় ওদের জমিদারি।"

এরপর ওকথা সেকথা। তার টাইপই এমন।

দুই মেয়ে আরিফ, সুরাইয়া দম্পতির। বড় মেয়ে তারানা স্বামীর সাথে থাকে ক্যানাডা। ছোট মেয়ে মেরিনা পড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ক্যাম্পাসও উত্তরায়।

অবসরে নিরিবিলি জীবন আরিফ সাহেবের। বিকালে হাঁটতে বের হন তিনি। দিয়াবাড়ির দিকটায় যান। ওখান থেকে বিমানবন্দরের রানওয়ে কাছে। সিনেমা, টিভি, সংবাদপত্রের কল্যাণে ঢাকার এ জায়গাটি একটু অন্যরকমই। বলা যায় পর্যটন স্পট। তরুণ তরুণীদের বেশি ভিড় থাকে এখানে। চলে সেলফি তোলা অগণন।

করোনায় অবশ্য অন্য বিকেল। বিমানবন্দরে প্লেন ওড়ে কম। লকডডাউনে মানুষও কম। কতক্ষণ বাসায় থাকা যায়? আরিফ সাহেব প্রতিদিন বিকেলে এখানে এসে এক চায়ের টঙে বসেন। সাইনবোর্ডহীন এ টঙ 'মিরজুর দোকান' নামে দিয়াবাড়িতে প্রচারিত। সারাদিনই টিভিতে নিউজ চলে এখানে। টঙে বেশি বসেন খ্যাপ শেষে ক্লান্ত রিকশাওয়ালা থেকে শ্রমজীবীরাই। ফিলিস্তিনের গাজায় বোমা নিক্ষেপ দেখেন তারা রঙ চায়ে টোস্ট ডুবিয়ে। তখন হয়তো কেউ বলে ওঠেন, "এই বোম কি আমেরিকা পাটাচ্ছে? শালারা বিটিশ!"

আরিফ সাহেবকে মিরজু ডাকে 'স্যার' বলে। তিনি আসলেই সালাম দেয়। এরপর এক কাপ চা পিরিচে করে তুলে দেয় তার হাতে। আরিফ সাহেব এখানে কথায় জড়ান না কারও সাথে। বৈকালিক হাঁটা শেষে বসে চায়ের তেষ্টা মেটান।

সেদিনও দোকানের টিভিতে খবর হচ্ছিল। পরণে 'আমরা এখন ফাইভ জি' লেখা টি-শার্ট আর ধূসর লুঙ্গি পরিহিত একজন শ্রমজীবী বললেন,"সাংবাদিককে ধইরেছে কুতায়?"

পাশের একজন উত্তর দেন, "স্বাস্থ্য অপিসে। ঐ যারা করোনার কথা কচ্ছে।"

আরিফ সাহেবের চা শেষ। উঠবেন এমন একটা ভাব। তখন তার ফোনে মেরিনার কল। গলায় ঝাঁজ।

- বাবা, তুমি এখনও বাইরে। আজকেও ৩৭ জন মারা গেছে। তাড়াতাড়ি বাসায় আসো।

'আসছি মা' বলে ফোন রেখে দেন আরিফ সাহেব। তিনি দাঁড়িয়ে চায়ের দাম মিরজুর হাতে দিতে যান। চোখ পড়ে তখন টিভি সেটে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃতের সংখ্যা জানানো হচ্ছিল তাতে। টঙে তার পেছনে কেউ মন্তব্য করেন তখন, "মহিলা সাংবাদিককে জেলে দেচ্ছে আর ওরা কবে সত্য কতা?"

আরিফ সাহেব টঙ দোকান থেকে বের হন। এবার বাসার দিকে হাঁটা। খেয়াল করলেন তার পাঞ্জাবিতে চায়ের কয়েক ফোঁটা পড়েছে। তিনি দ্রুত হাঁটেন। বাসায় গিয়ে প্রথমেই পাঞ্জাবির দাগ তুলতে হবে।

আইয়াম শেখের গল্প

মহল্লার আইয়াম শেখ কলোনির বাসায় বাসায় আসতেন। রিকশা ভ্যানে মাছ বিক্রি তার পেশা। কেমন আশ্চর্যভাবে তিনি ডাকতেন, "ঐ টাটকা ইলিশ! তাজা পাঙ্গাস!"

প্রায়ই মাসের শেষ দিকে সন্ধ্যায় বাসায় আসতেন। আব্বার কাছে টাকা ধার চাইতেন। কখনও ১০০/২০০ কখনও পাঁচশ। সরকারি চাকুরে আব্বার বেতন কত জানতাম না। অজানা ছিল আম্মার সংসার চালানোর কায়দাও। তবু মহল্লার মাছ বিক্রেতা আইয়াম ভাই খালি হাতে ফিরতেন না। টাকা নেয়ার সময় তিনি বলতেন, "মাস পয়লা দিমুনে ভাই।" কিন্তু প্রায়ই দেখতাম মাস পয়লা তার খোঁজ নেই। কলোনির দিকেও আর আসেন টাসেন না। পরে তার মাছের ভ্যানের দিকে আমাকে নিয়ে আম্মার অভিযান। মাছের দামের সাথে চলত ধার নেয়া টাকার কাটাকাটি। আম্মা মাছের পলিথিন আমার হাতে দিতেন। মাছ তো ভালোই। কিন্তু মাছের পলিথিন টানতে ভালো লাগে না। বিশ্রী গন্ধটা। মাছের পানিতে আবার প্যান্টে জামায় দাগ বসে যেত। স্কুলে, বাসায় পরার প্যান্ট আবার আমার একটাই। কিন্তু আম্মাকে তা বলার উপায় নেই। তার এক কথা- "খাইতে পারো। নিতে পারবা না কেন?"

যাহোক, আইয়াম শেখ প্রসঙ্গে আসি। তিনি অনেক দিন বাসায় আসেন না। ৯৬ সালের ভোটের সময় দেখি, তিনি ক্যানভাস করছেন। তার মাছ ফেরির রিকশা ভ্যান উধাও। সারাদিন মাইক টাঙানো রিকশায় ঘুরে ঘুরে ভোট চান। এলাকার চায়ের দোকানে অনেক লোক নিয়ে বসে থাকেন।

মহল্লার মসজিদের পাশে একটা ফাঁকা প্লট ছিল। আমরা অনেক সময় স্কুল ছুটি শেষে সাত চাড়া খেলতাম সেখানে। একদিন দেখি সকালে এই প্লটের সামনে কয়েকটা র‍্যাব, পুলিশের গাড়ি। আবার ক্লাস শেষে ফিরে দেখি ইটের দেয়াল উঠছে। পরদিন সকালে দেখি দেয়াল তোলা শেষ। গেট বসেছে। একটা